International Journal of Humanities & Social Science Studies (IJHSSS)
A Peer-Reviewed Bi-monthly Bi-lingual Research Journal
ISSN: 2349-6959 (Online), ISSN: 2349-6711 (Print)
Volume-III, Issue-V, March 2017, Page No. 88-95
Published by Scholar Publications, Karimganj, Assam, India, 788711
Website: http://www.ijhsss.com

কালকূটের আখ্যানে মানুষ খোঁজার গান

শ্রীতম মজুমদার
গবেষক, বাংলা বিভাগ, কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়, উত্তরপ্রদেশ, ভারত

Abstract

The Marginalized communities of people are vibrant and dynamic in their own beauty. Kalkut (Samaresh Basu) was one of the foremost authors to deal with a Marginalized community in his works. He has been capable in bringing out beautifully the daily chores of the simplest life and living of the Bauls. He has kept on searching the Supreme Being, the man of his soul. The Bauls are away from the so called normal social stratification. Still, each one of them have got a family bondage. Their lifestyles in an ochre robe and an 'Ektara'. The simple yet touching lyrics of the Baul songs gives a scope of mental sublimation amongst human beings. The paper would also attempt to portray how the effectiveness of folk songs (searching of men) in his works.

Key Words: Kalkut, Human beings, Bauls, Baul Songs, folk culture.

বাংলা কথাসাহিত্যে লোকসংস্কৃতির প্রভাব বেশ সুস্পষ্ট। কথাসাহিত্যের ধারায় কথাকারদের লোকসংস্কৃতি চর্চার দিকটিও এক অনন্য স্বাদ এনে দিয়েছে পাঠককে। লোকসঙ্গীত বা লোকগান লোকসংস্কৃতিরই একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ। এই লোকসঙ্গীতের মধ্যে বাউল গান এক অভূতপূর্ব আয়োজন, অসাধারণ তার আবেদন, বিপুল তার জনপ্রিয়তা। বাউলের সৃষ্টি ও সৃজন এই বাংলাতেই। বাংলার মাটি ও মানুষের সঙ্গে একাত্ম হয়ে রয়েছে বাউল। বাউল একটি লোকাচার, বাউল আবার দর্শনও। বাউলের গান মানুষের জীবনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। যে গান উচ্চ নীচের ভেদাভেদ রাখে না, সে কেবল 'মনের মানুষ'-এর অন্বেষণ করে। বাউলের গানে যা 'মনের মানুষ' সে তো একপ্রকার মানুষেরই অন্তরাত্মাই, ঈশ্বরীয় সত্ত্বা। দেহ আবরণের ভিতরে ঈশ্বরীয় সত্ত্বাটিই অচিন পাখির রূপ ধরে রয়েছে। বাউল মানুষের কণ্ঠে দোলা লাগলেই মনের মানুষের প্রতি আপন মনের ভাবটি বাইরে উন্মোচিত হয়। সব ধর্ম বর্ণ জাতির গোঁজামিলকে তুলে দিয়ে কেবলমাত্র মানুষকে, তার মনুষ্যত্বের ধর্মকে প্রাধান্য দিতেই অবতারণা 'মনের মানুষ' তত্ত্বের।

রবীন্দ্রনাথ এই বাউল মানুষদের দেখেছিলেন খুব কাছ থেকে। সে কথার হদিশ মেলে তাঁর কবিতার পাতায় চোখ রাখলে-

'কতদিন দেখেছি ওদের সাধককে
একলা প্রভাতের রৌদ্রে সেই পদ্মানদীর ধারে,
সে নদীর নেই কোনো দ্বিধা
পাকা দেউলের পুরাতন ভিত ভেঙে ফেলতে।
দেখেছি একতারা-হাতে চলেছে গানের ধারা বেয়ে
মনের মানুষকে সন্ধান করবার

গভীর নির্জন পথে।'[১] (ঠাকুর, পৃ-১)

কবিতায় তাদের পথ চলার কাহিনি তুলে ধরে কবি এবার উপন্যাসেও সেই সুর বাঁধলেন। ১৯১০ খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখলেন 'গোরা' উপন্যাস। যে উপন্যাসের শুরুই লালনের বাউল গানের হাত ধরে- 'খাঁচার ভিতর অচিন পাখি কেমনে আসে যায়/ ধরতে পারলে মনোবেড়ি দিতেম পাখির পায়।' রবীন্দ্রনাথের আগ্রহেই বাউল সমগ্র বিশ্বে পরিচিতি লাভ করে। সময়ের তালে তালে বাউলের গান ধীরে ধীরে প্রচার লাভ করে এবং জনমানসে প্রচারের ফলে সাধারণ মানুষের মধ্যে বাউলের প্রতি, বাউল গানের প্রতি সশ্রদ্ধ মনোভাব জাগতে শুরু করে।

পশ্চিমবঙ্গের বিস্তীর্ণ রাঢ় অঞ্চলের বাউলকে অনেকে 'খ্যাপা' বলে থাকেন। 'বাউল'- এই কথাটির মধ্যেই বাংলার জীবন ও সংস্কৃতিকে খুঁজে পাওয়া যায়। বাংলার মূল সংস্কৃতি ও জীবনকে জানতে গেলে বাউলের অস্তিত্বকে কখনোই অস্বীকার করা যায় না। সমাজ জীবনের ঘেরাটোপের বাইরে বাউলদের বাস। তবু তাদের জীবনেও কোথাও যেন এক সংসারী মানুষ বসত করে। তাদের ধর্মতত্ত্বের মূল কথা হল গোপনীয়তা। এই গোপনীয়তাকে রক্ষা করতে বাউলেরা সদা সতর্ক। বংশ পরম্পরায় নয়, বাউলের জীবন অতিবাহিত হয় গুরু পরম্পরায়। গুরুর থেকে শাশ্বত কথন পৌঁছায় শিষ্যের কর্ণকুহরে। শিষ্যকে সচেতন করা হয় এই তত্ত্ব যেখানে সেখানে সে যেন প্রকাশ না করে। বাউলের কথায়- 'আপন ভজন কথা/ না কইবি যথা তথা।/ আপনাতে আপনি হইবে সাবধান।' গোপনীয় বিষয়বস্তুর প্রতি মানুষের অদম্য কৌতূহল। বাউলেরা মনের মানুষের খোঁজ করতে করতে আসলে খুঁজে চলে বোধ হয় নিজেকেই। কারণ সব খোঁজার থেকে বড় হল নিজেকে খোঁজা, নিজেকে জানা। বাউলেরা এই আত্মানুসন্ধানেই মগ্ন থাকে। গান গেয়ে গেয়ে মনের সঙ্কীর্ণতাকে দূর করে। সমাজের মধ্যে নির্মিত মন্দির-মসজিদের কাঠামোকে অস্বীকার করে আপন দেহকেই মন্দির-মসজিদ গণ্য করে অন্তরাত্মার আরাধনায় নিমগ্ন থাকে বাউলেরা।

বাউল গান নির্ভর মানুষ। একতারায় সুর তুলে গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে বাউলেরা গান গেয়ে গেয়ে মানুষ খুঁজে বেড়ান। তাদের গানের কথায় থাকে আলো-আঁধারি শব্দের মায়াজাল। বাউলের গানে থাকে জীবন ও আধ্যাত্মিকতার এক নির্মল মনোহর সংযোগ। বাংলা লোকসঙ্গীতের ধারায় বাউল গান যে এক ঐতিহ্য এবং স্বতন্ত্র একটি ধারা, সেটি বিদ্বজনেরাও মানেন। স্বভাবতই, কবি সাহিত্যিকদের কলমেও বাউলের গান গান তাদের রচনাকে সমৃদ্ধ করবে, একথা বলা বাহুল্য।

পশ্চিমবঙ্গের গ্রামবাংলার লোকসংস্কৃতিতে কেঁদুলির জয়দেবের মেলা প্রাণের ঐতিহ্যকে বহন করে। এই মেলা মূলতঃ বাউল মেলা। গীতগোবিন্দের স্রষ্টা জয়দেব গোস্বামীর মৃত্যু ঘটেছিল সম্ভবত ইংরেজির ১২০৩ খ্রিষ্টাব্দে, জানুয়ারি মাসের মাঝামাঝি সময়ে। বাংলার পৌষ সংক্রান্তির তিথিতে। কবি জয়দেবের এই তিরোধানকে কেন্দ্র করে এই মেলার সূচনা। মেলার স্থানটি বড়ই অদ্ভুত। একপ্রান্তে বীরভূম, অন্যপ্রান্তে বর্ধমান, মাঝে বয়ে চলেছে অজয় নদী। এই বিস্তীর্ণ অঞ্চলটি জুড়ে বসে মেলা। যেখানে রয়েছে জয়দেবের ছোঁয়া, বাউল-ফকিরদের মেলা।

সমরেশ বসু (১৯২৪-১৯৮৮ খ্রিষ্টাব্দ) 'কালকূট' ছদ্মনামে দেশজ সংস্কৃতি ভিতর আবহমানকালের যে লঘুস্রোত বয়ে চলেছে তারই অন্বেষণে বারংবার ছুটে গেছেন রাঢ় বাংলায়। প্রত্যক্ষ করেছেন আউল বাউল জীবনের মানুষ আর একতারার টুং-টাং সংসার। উদার হৃদয়ে দেখলেন বাউল জগতের বিশ্বপ্রেমকে, সঙ্কীর্ণতাহীন এক বাস্তবজীবনকে। বাউলের গানে তিনি শুনলেন মানুষের বন্দনা, মনের মানুষকে পাবার আকুতি।

মানুষ খুঁজে ফেরার আবেগে কালকূট দেখলেন প্রাচীন জয়দেবকে, তাঁর প্রাঙ্গণকে। পাঠককে দেখালেন এই অজয়ের তীরেই ছিল কবি জয়দেব গোস্বামীর কবিতা চর্চার ঘর-সংসার। তাঁর স্মৃতিতেই এই মেলার আয়োজন, গুবগুবি ও একতারা নিয়ে বাউলদের বিপুল সমাবেশ। বাউল গানের আবহে এক মিষ্টিক পরিবেশ আচ্ছন্ন করে

রেখেছে জয়েদেবের প্রাঙ্গণকে। বাউল গানের মাধ্যমে সীমা অসীমের মিলনের তত্ত্ব ঠোরে ঠোরে বুঝিয়ে দিচ্ছে বাউলেরা। এই গানে রসিকের মন ভিজুক বা না ভিজুক কালকূট এঁকে চলেছেন জয়দেবের মেলার অপূর্ব চিত্ররূপ।

> "অজয়ের উঁচু পাড়ে উঠে প্রথমেই গোরুর গাড়ির ভিড়। তারপরেই মেলার শুরু। ...মানুষ চলেছে আজব কলে।"[২] (কালকূট. পৃ-৩৩২)

কালকূট মুক্তির স্বাদ পেতে এতো কালঘাম ছুটিয়ে যে এসেছেন এই জয়দেবের বাটে, সেই মানুষটি হৃদস্পন্দন দিয়ে অনুভব করতে চান মেলার আসল রূপকে-

> "ছায়াময় এক নতুন দেশ যেন। সেখানে সংসারের যাবৎ ছেঁড়া কাপড়ের টুকরোয় টুকরোয় হলদে লাল আসমানি রঙ-এর পুরো আলখাল্লার ভিড়। চুলের চুড়োয় কষা বাঁধন নাচের উল্লাসে স্খলিত, বাতাসে চূর্ণ চূর্ণ। ডারা-ডুপকি-খঞ্জনি, কাঠ-করতালি-প্রেমজুরি-খঞ্জনি, ঐ যা বলো, সব আপন তালের আপনি মগ্ন। একতারা দোতারা বাঁয়া, লাগ-বুঙা-বুঙ গুপীযন্ত্র, সব পায়ের ঘুঙুরে দিচ্ছে সাড়া। গলার স্বরে আত্মহারা।"[৩] (কালকূট. পৃ-৩৩২-৩৩৩)

কালকূটের ধাতস্থ হতে একটু সময় লাগল। চতুর্দিকেই দেখছেন নানান বাউল। তারা প্রত্যেকেই কোমর দুলিয়ে আপন আবেগে গান গাইছে। গানেই তারা প্রশ্ন তুলছে, গানেই এই প্রশ্নের নিরসন করছে। কালকূটের চোখে পড়ল বাউলদের গাঁজা খাওয়ার আমুদে চিত্রটি। সব মিলিয়ে বেশ জমজমাট বাউল সমাবেশ। বাউলদের বেশভূষার দিকে তাকিয়ে কালকূট দেখলেন-

> "বাউলের আলখাল্লা নয়। গেরুয়া বসনও আছে অঙ্গে।। মাথায় আছে পাগড়ি। হাতে অনেকের লোহার বালা। কাঁধের ঝুলি নামাবার অবসর হয়নি। জয়-গুরু! জয়-গুরু! বলে, অভিনন্দন প্রত্যাভিনন্দনের পরেই একতারাতে ঠুং ঠুং। বাঁয়াতে বুগ্ বুগ্।"[৪] (কালকূট. পৃ-৩৩৩)

তাদের গানের কথায় জলের মধ্যে আগুন জ্বালার গূঢ় কথার রহস্য শোনা যাচ্ছে। এ যে গভীর তত্ত্বকথা ! অজয়ের জল নিজের বহমান ধারা অক্ষুণ্ণ রেখে বয়ে চলেছে, আর এ পাড়েতে মানুষ গাইছে চিরায়িত প্রেমের গান, বাউলের গান। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের বিভীষিকা এই বাউল মানুষদের মুখ থেকে গানকে কেড়ে নিতে পারেনি। দুই দশক জুড়ে বাংলায় যে মন্বন্তর চলেছিল সেই মন্বন্তরের করাল গ্রাসও বাউল মানুষদের উৎখাত করতে পারেনি। পারেনি তার কারণ আছে। কারণ বর্তমান দিনেও আলখাল্লার মধ্যে কোথাও এতটুকু অহম্-এর ছাপ নেই, তাই। শুধু বিশ্বযুদ্ধ বা বাংলার মন্বন্তর নয়, তারা বিপর্যস্ত হয়েছে সমাজেরই মানুষের কাছ হতে, পদে পদে, প্রতি পদে। মননশীল বাউল গবেষক অধ্যাপক সুধীর চক্রবর্তী তার 'কালকূট : লোকে লোকায়তে' প্রবন্ধে বাউল ধ্বংসের ব্যাপারটি নিয়ে বলেছেন-

> "আমাদের দেশে বহুকাল থেকে বাউল বৈরাগি দরবেশ ফকিরদের খুব একটা উঁচু চোখে দেখা বা দেখানো হয়নি। তাঁর কারণ তারা সমাজের দলছুট এবং নিম্নবর্গীয়। তাদের জীবনে তেমন কোনো বাঁধন নেই, আচরণে নেই শরিয়ত বা বেদসম্মত গার্হস্থ্য। মৌলবি বা সমাজপতি ব্রাহ্মণকে আর তাঁদের শাস্ত্রকে তারা মানেননি কোনোদিন। গ্রামে থেকেছে অন্ত্যবাসী হয়ে। তীর্থ, ব্রত, উপবাস, নামাজ, কলেমা বা উপবীতকে তারা মান্যতা দেয়নি। এমনকি বিবাহ বন্ধনকে বোধ করেনি আবশ্যিক বলে। তাই কোনকালেই তারা সমাজের মূলস্রোতে প্রতিষ্ঠা পায়নি, প্রাতিষ্ঠানিক সহায়তা জোটেনি। অথচ মূলত মানুষভজা সংবেদী এমন মানুষগুলি সমাজ কাঠামোয় কোনো সংকট সৃষ্টি করেনি কখনও বরং সমন্বয় মন্ত্র দিতে গিয়ে তারা সংকটাপন্ন হয়েছে বারেবারে। ধর্মধ্বজীরা তাদের একতারা ভেঙে দিয়েছে, আখাড়া জ্বালিয়েছে, করেছে সর্বকেশ কর্তন। প্রতিরোধ তারা করতে পারেনি, প্রতিবাদও তেমন করে নয়। কেননা তাদের জমি নেই,

সংঘ নেই। তারা ছড়িয়ে থাকে নানা ধ্বস্ত জনপদে। গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম বা শরিয়তি ইসলামের মতো তাদের মাথায় কোনো সংগঠিত সান্ত্বনা বা জনশক্তির ছাদ নেই।"[৫] (চক্রবর্তী, পৃ-৮৭)

কালকূট অবাক হয় তাদের উদার মানবিক আচরণে। মনের মধ্যে যে প্রশ্ন কালকূটকে তোলপাড় করতে থাকে তাঁর সে জিজ্ঞাসার নিরসন করে দেয় সিউড়ির এক বুড়ো বাউল-

"অ বাবু, এ আর কী দেখতেছেন! সব গেঁইছে, এখন আর চাট্টি বাউলে ঠেঁইকেঁছে। এও যায় যায়। যাবে গা, বাউল থাকবেক না।"[৬] (কালকূট. পৃ-৩৩৩)

কথার মধ্যে এক আক্ষেপের সুর ভেসে আসে। এই আক্ষেপের স্বরই বাউলদের বর্তমান জীবন। এই হল তাদের যন্ত্রণার জীবন, বেদনার জীবন। এই ব্যথাতুর বেদনাময় ইতিহাসই বাউলকে ক্ষমাশীল করে তুলেছে, বাউলের দর্শনকে মহিমা দান করেছে।

বাউলের কাছে জয়দেব কেঁদুলির মেলা হল মহাতীর্থক্ষেত্র। জয়দেবের পাটে সব বাউলকে আসতেই হবে। 'অমৃতকুম্ভের সন্ধানে' উপন্যাসে রবি বাউলের প্রসঙ্গেও বলরাম এমনটাই বলেছিল। সেও নাকি রবি বাউলকে জয়দেবের প্রাঙ্গণে দেখে থাকবে। বস্তুত এমন কোন বাউল নেই যে জয়দেবে আসেনি বা আসে না। বুড়ো বাউলের কণ্ঠেও সে সুর শোনা গেল-

"অ বাবু, এ-শরীলের ভাণ্ড হলেন বেক্ষাণ্ড। মানুষের নিজের মধ্যে সব। জয়দেবে বাউল আসবেক না, নিজেকে খোঁজার জ্বালা সে থোবে কুথা?"[৭] (কালকূট. পৃ-৩৩৪)

জয়দেবের পাটেই কালকূট দেখেছেন বাউল-বাউলানির ভিড়। যেখানে খুঞ্জনি, বাঁয়া, একতারা আর ডুপকির তালে তাল দিয়ে বাউল হয়েছে আত্মহারা-

"বাঁয়ে ইড়া ডাঁয়ে পিঙ্গলা
সুষুম্না মাঝে,
রজ আর তমর মাঝে,
গুণ বিরাজে।"[৮] (কালকূট. পৃ-৩৩৪)

পদ্মাবতী জয়দেব গোস্বামীর প্রকৃতি, সাধনসঙ্গিনী। সহজ সাধনের প্রকৃতি বলে পদ্মাবতীকে জয়দেবের প্রকৃতি বলে গণ্য করা হয়। শ্রী রাধামাধবের যুগল বিগ্রহকে সামনে প্রতিষ্ঠা করে জয়দেব-পদ্মাবতী নিষ্কাম প্রেম সাধনায় মগ্ন থাকতেন। রাধাকৃষ্ণের সূত্র ধরে বিরহ ও মিলনের পদ রচনায় জয়দেবের প্রেরণা ছিলেন পদ্মাবতী। সেই সূত্রে ন্যাড়া বাউলও লাল শিমুল ফুলের মতো রাঙা হয়ে দলে দলে এসে ভিড় করে জয়দেবের পাটে।

পৌষ সংক্রান্তিতে কেঁদুলিতে জয়দেবের তিরোধানকে কেন্দ্র করে ঝাঁকে ঝাঁকে যে বাউলের সমাগম হয়েছে, কালকূট এঁকে বলেছেন- বাউল কংগ্রেস। কংগ্রেস অর্থাৎ মহাসভা, সম্মেলন। জয়দেবের মেলা পৃথিবীর প্রাচীনতম মেলা এবং বাংলার দ্বিতীয় বৃহত্তম মেলা। শোনা যায়, খ্রিষ্টীয় অষ্টাদশ শতকে নিত্যানন্দের পুত্র বীরভদ্র সহজিয়াদের বৈষ্ণব ধর্মের অন্তর্ভুক্ত করলে তাঁরা বৈষ্ণব সহজিয়া সম্প্রদায় নামে পরিচিত হয় এবং এঁদের থেকেই বাউলের উৎপত্তি। এই মেলা হল বাউলদের বাৎসরিক উৎসব, মহামিলন উৎসব। আর দল থাকলেই মিলন হবে। এই মিলনের ইতিহাস জয়দেবের আঙিনায় বহুদিন ধরে চলে আসছে। সে ধারাকে অক্ষুণ্ণ রাখতেই বাউলের এখানে আসা।

"বাউল আছে যে যেখানে, সবাইকে আসতে হবে, তাহলে বুঝতে হবে নদীতে আর বান নেই। উৎসে তার টান ধরেছে অনেকদিন।"[৯] (কালকূট. পৃ-৩৩৪)

কালকূট প্রশ্ন করেছেন, 'বাউল কবেকার?' তিনি শুনেছেন কৃষ্ণদাস কবিরাজের চৈতন্যচরিতামৃতে অনেকবার বাউল শব্দের ব্যবহার হয়েছে। চণ্ডীদাসও তার পদে বাউলকে এনেছেন। কালকূটের মনে প্রশ্ন জাগে-

> "জিজ্ঞেস করি, বাউল কে? তবে শুনি, 'সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই।' 'সেই মানুষ ফিরি খুঁজে', তাই আমি বাউল। সে মানুষ কে? সে মনের মানুষ, সহজ মানুষ, সে রসিক, সে অচিন পাখি, সে অধরা। সেই 'সোনার মানুষ ভাসছে রসে। সেই আলোকের মানুষ আলোকে রয়।' সংসারের 'এই মানুষে সেই মানুষ আছে।"[১০] (কালকূট. পৃ-৩৩৫)

কালকূটের আরও প্রশ্ন- কেমন করে পাওয়া যায় মনের মানুষকে ? উত্তর মেলে 'সহজ সাধনে', 'সহজ ভজনে।' মানুষের সঙ্গে মানুষের মিলনেই তাকে পাওয়া যায়। নারী আর পুরুষের প্রেম দিয়েই সহজ সাধন-ভজন সম্ভব। এতো কালকূটের মন ভরে না। এক উত্তরহীন জিজ্ঞাসা তাঁকে তাড়িয়ে মারে-

> "তার রূপ নেই, সে অরূপ। তার ভাষা নেই, সে অনির্বচনীয়। সে শুধু অনুভবের স্পন্দন। এই সহজ সাধন 'রেচক, পূরক স্তম্ভন দিয়ে নদী কর বন্ধন।' কিন্তু 'সে নদী অত্যন্ত গভীর, আছে কামরূপী কুম্ভীর।' 'কুল কুণ্ডলিনী শক্তি রয় মূলাধারে, প্রণয়ের যোগে জাগাও তাহারে।"[১১] (কালকূট. পৃ-৩৩৫)

কালকূটের ১৯৬০ খ্রিষ্টাব্দে লেখা 'খুঁজে ফিরি সেই মানুষে' রচনাটিকে বাউল ভাবনার প্রধান এবং অন্যতম ক্ষেত্র সমীক্ষাগত প্রয়াস বলা চলে। এটিকে 'কোথায় পাবো তারে' বৃহৎ উপন্যাসের মুখবন্ধ বলা যেতে পারে। কালকূট চলেছেন জয়দেব কেন্দুলির পথে, বাউল মেলায়। বীরভূমের পথের ধুলোয় রাঙা হয়ে লালনের পদ আওড়েছেন-

> "ক্ষ্যাপা, না জেনে তোর আপন খবর
> যাবি কোথায়।
> আপন ঘর না বুঝে,
> বাইরে খুঁজে
> পড়বি ধাঁধায়।"[১২] (কালকূট. পৃ-৩২৯)

জয়দেবের মেলা প্রাঙ্গণে এসে কালকূট দেখলেন এক আশ্চর্য 'বাউল সমাবেশ।' যেখানে অনেক বাউল ছোট্ট ছোট্ট আসর জমিয়ে একতারা, বাঁয়া আর গুবগুবির সহযোগে দিব্যি গেয়ে যাচ্ছে-

> "ওরে খ্যাপা!
> মন আছে তোর মনের ভিতরে
> তারে একবার দ্যাখ না নেড়ে চেড়ে।
> দেখবি সেথায়, জলের মধ্যে আগুন জ্বলে,
> নিরালায় সে আছে বসে নীরে আর ক্ষীরে।
> মন আছে তোর মনের ভিতরে"[১৩] (কালকূট. পৃ-৩৩৩)

এই অপূর্ব সমাবেশের মাঝে কালকূট বাউলের অস্তিত্ব সংকটকে অনুভব করেন। অধর মানুষকে পাবার সাধনায় যারা মত্ত তাঁদেরই এক জনৈক বাউলের মুখে কালকূট শোনেন বাউলের বর্তমান, বাউলের ইতিহাস মুছে যাবার ইঙ্গিত বাণী-

> এক দেহন্তে হলি কানা
> (তাতে) মানুষ জনম আটকাবে না।
> মানুষ যদ্দিন থাকবে রে মন
> তারে সাধতে হবে মন মনা।"[১৪] (কালকূট. পৃ-৩৩৩)

মানুষ যতদিন থাকবে মনের মানুষকে ভজনার প্রথা রয়েই যাবে। সে বাউল থাক বা না থাক।

বাউল মোহন কালকূটকে তাঁর স্ত্রীর পরিচয় দিতে গেয়ে ওঠে-

"চন্ডীদাসের রজকিনী
যুগল প্রেম তারি শুনি
পদ্মাবতী চিন্তামণি
বিষম রসে পাতলি ঘুনি
নয়ন কোণে ঝলক দিয়ে
বাঁধগা এবার তিরিবেণী।।"[১৫] (কালকূট. পৃ-৩৩৪)

কালকূট দেখলেন বাউল মোহনের কায়াসঙ্গিনীকে। সহজ পরিচয়ে বুঝলেন বাউলানিকে।

মেলার অন্যত্র বাউলের তিনজনের আসর দেখে কালকূট পা বাড়ালেন। একতারা, বাঁয়া, ডুপকি ও খুঞ্জনির তালে তাল মিলিয়ে বাউলত্রয়ী গাইছে গান-

"বাঁয়ে ইড়া ডাঁয়ে পিঙ্গলা
সুষুম্না মাঝে
রজ আর তমর মাঝে
গুণ বিরাজে।"[১৬] (কালকূট. পৃ-৩৩৪)

বাউলদের নিয়ে শহুরে মানুষদের উৎসাহ কিছু কম ধরা পড়ছে না কালকূটের চোখে। সোনার গহনা পরিহিতা, আধুনিক সাজসজ্জায় পরিবৃতা এক জনৈক বাউলানিকে ঘিরে তাদের উন্মাদনা প্রকাশ পেয়েছে। তারই দলের এক নবীন বাউল বাঁয়া বাজিয়ে গান গাইছে-

"আমি দোষ কারুরে দিব না,
আমি রয়েছি যেই সেই কানা।
কুস্বভাবের ফেরে পড়ে
কুইচ্ছের নেহা ক'রে
সেই একের মধ্যে সার অসার গুরু বস্তু চিনলাম না।
ওরে মন, ফিরে যা তাড়াতাড়ি
হবার আগে ভরাডরি (ভরাডুবি)
গড়েছি বাঁদর অধর ধরতে পারলাম না"[১৭] (কালকূট. পৃ-৩৩৬)

গানে পুরোপুরি মজে উঠেছে নবীন বাউল। উন্মাদনা ভর করেছে তাঁর সারা শরীরে, মনে। হরিণের মতো মাঝে মধ্যেই লাফ মেরে মেরে কোমর দুলিয়ে কয়েকজন বাউল তাঁর সঙ্গে সঙ্গ দিচ্ছে। বাউলদের সঙ্গে এবার যোগ দিল বাউলানি রাধারানী-

"যদি সে থাক হরি
নিয়ে নামের তরী
আমারে নিয়ো পারো ক'রে।
কে সে কোথা যায় বেয়ে
ও তরীখানা দাও ধরিয়ে।
যদি না নেয় তরীতে

ওগো, আমি যাব দাঁড় ধরি।"[১৮] (কালকূট. পৃ-৩৩৬)

রাত্রি হয়েছে। অজয়ের পাড় বেয়ে নেমে এসেছে কালো অন্ধকারের চাদর। বটগাছের পাতার ফাঁকফোকর থেকে দেখা যাচ্ছে পূর্ণিমার চাঁদকে। আর বটের নিচে চলছে গঞ্জিকা সেবন। মেলার পাশেই একটি মাথা গোঁজার ঠাঁই বানিয়ে নিয়েছে গোপাল, রাধারানী ও তাঁর দল। দলের এক সেবক দীনবন্ধু রাধারানীর আজ্ঞা নিয়ে গান পরিবেশন করেছে-

"আমার এক কলসে নয়টি ছিদ্র,
কেমনে রাখি জল গো সখী,
কেমনে রাখি জল।
ছিদ্রের এমনি গুণাগুণ
সব সময়ে, সব ছিদ্রে,
জল পড়ে না তেমন।
গালা কিংবা মোম জমায়ে
বন্ধ করতে যাই
বহির্মুখের স্রোতের ধারায় খুলিয়া পলায়
ছিদ্রের ভিতর মুখে প্রলেপ দেওয়ার
কী করি কৌশল।"[১৯] (কালকূট. পৃ-৩৩৭)

পরবর্তী গান ধরেছে আবার রাধারানী-

"ও মন এবার কোনো উপায় দেখিনা
অটল মানুষে ডাকতে (আমার) সরে না রসনা।"[২০] (কালকূট. পৃ-৩৩৮)

রাধারানীর অনেক গান কালকূট শুনেছেন ঐ কেন্দুলির পাটে। তবে যে বাউল গানটি কালকূটের হৃদয় মনকে বিশেষভাবে ছুঁয়েছে, সেটি হল-

"আমার যেমন বেণী তেমনি রবে,
চুল ভেজাব না।"[২১] (কালকূট. পৃ-৩৩৮)

মেলা প্রাঙ্গণে কোথাও হ্যারিকেনের আলো জ্বলছে তো অধিকাংশেই আলোহীন। দূর থেকে একটা আলো আঁধারি ভাব কালকূট প্রত্যক্ষ করছেন। লেখকের ভাষায়, 'স্পষ্ট, কিন্তু সবই অস্পষ্ট।' বাঁয়া ডুপকি একতারা আর প্রেমজুরি নিয়ে বাউলেরা দিব্যি রয়েছে। এমন করেই চলল কালকূটের আত্মবিশ্লেষণ, আত্মচিন্তন, আত্মমন্থন। মেলা প্রাঙ্গণে এসে থেকে কালকূট শুনেছেন কত শত বাউল বাউলানির গান। রচনার শেষে কালকূট পৌঁছে গেছেন এক চিরায়িত জীবনসত্যে-

> "মানুষ নিজেকে খুঁজবে। মানুষে মানুষে ভালবাসাবাসি করবে, মানুষের মধ্যেই সে সর্বমনিবের অপরূপ রূপ দর্শন হবে, একথা চিরদিন বলতে হবে আমাদেরই। বাউল যেদিন থাকবে না, সেইদিনও।"[২২] (কালকূট. পৃ-৩৩৮)

কালকূটের উপন্যাসে ব্যবহৃত বাউলগান রচনাগুলিতে এক ভিন্ন মাত্রা সংযোজন করেছে, আর সেই সঙ্গে সঙ্গে উপন্যাসের গতিকেও ত্বরান্বিত করেছে। মামুদ গাজী, গোপীদাস বাউল, গোকুল দাস, বলরাম, দীনবন্ধু, সুজন, রাধারাণী, মনোহরা, প্রভৃতি বাউল বাউলানির মুখে বাউলের গান এক অনবদ্য শোভা লাভ করেছে। 'যে জন প্রেমের ভাব জানে না/ তার সঙ্গে কিসের লেনাদেনা'। - এই গান গায় তারা নিভৃত স্বরে। খুঁজে ফেরে মানুষের মধ্যে

মানুষকে। পরিশেষে বলা যায়, মানব জীবনের এটাই তো চরম প্রাপ্তি- 'নিজেকে জানা'। জানার তো কোন শেষ নেই। অনন্ত অসীম। জ্ঞান ও মনের অতীত। নিজেকে যখন সম্পূর্ণভাবে সঁপে দিতে পারা যায় তখনই সব প্রশ্নের উত্তর মেলে। নিজেকে জানা হয়ে ওঠে। ঈশ্বরের স্বরূপ তো প্রেমেই পরিলক্ষিত হয়। সকলের প্রতি প্রেম বিলালেই ঈশ্বরকে পাওয়া যায়। পরম আনন্দ অনুভূত হয়। বাউল সে কথায় বলে, মনকে ভিতরে ও বাইরে স্থির রেখে সহজ অবস্থায় স্থিতু হওয়াটাই বাউলের জীবনাদর্শের মূলকথা। কালকূটের আখ্যানে সেই মানব প্রেমের কথায় পাতায় পাতায় বর্ণিত হয়েছে, তাঁর আখ্যানে গীত হয়েছে মানুষ খোঁজার গান।

তথ্যসূত্র:

১। (http://www.rabindra-rachanabali.nltr.org/node/14211/) Date: 27.03.2017
২। কালকূট. 'খুঁজে ফিরি সেই মানুষে'. কালকূট রচনা সমগ্র. প্রথম খণ্ড. সম্পা. নিতাই বসু. কলকাতা: মৌসুমী প্রকাশনী, ২০০৯, পৃ-৩৩২
৩। তদেব, পৃ-৩৩২
৪। তদেব, পৃ-৩৩৩
৫। চক্রবর্তী, সুধীর. 'কালকূট: লোকে লোকায়তে'. সাহিত্যের লোকায়ত পাঠ. কলকাতা: পত্রলেখা, ২০১৩, পৃ-৮৭
৬। কালকূট. 'খুঁজে ফিরি সেই মানুষে'. কালকূট রচনা সমগ্র. প্রথম খণ্ড. সম্পা. নিতাই বসু. কলকাতা: মৌসুমী প্রকাশনী, ২০০৯, পৃ-৩৩৩
৭। তদেব, পৃ-৩৩৪
৮। তদেব, পৃ-৩৩৪
৯। তদেব, পৃ-৩৩৪
১০। তদেব, পৃ-৩৩৫
১১। তদেব, পৃ-৩৩৫
১২। তদেব, পৃ-৩২৯
১৩। তদেব, পৃ-৩৩৩
১৪। তদেব, পৃ. ৩৩৩
১৫। তদেব, পৃ. ৩৩৪
১৬। তদেব, পৃ. ৩৩৪
১৭। তদেব, পৃ. ৩৩৬
১৮। তদেব, পৃ. ৩৩৬
১৯। তদেব, পৃ. ৩৩৭
২০। তদেব, পৃ. ৩৩৮
২১। তদেব, পৃ. ৩৩৮
২২। তদেব, পৃ. ৩৩৮